আলো পাঠ

এমএলই নিউজলেটার
চতুর্দশ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬

মাতৃভাষার বই পাচ্ছে পাঁচ নৃগোষ্ঠীর শিশুরা

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুরা নিজের মাতৃভাষায় লেখা প্রাক-প্রাথমিক বই পাবে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ঢাকার মাতুয়াইলে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য বই ছাপানো হচ্ছে এমন দুটি ছাপাখানা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

এবার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পাঁচটি ভাষায় প্রাক-প্রাথমিকের বই ছাপানো হয়েছে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আদিবাসী নৃগোষ্ঠীর সকল ভাষার লিপি নেই, সাহিত্য নেই, লেখা নেই। যেটা আছে আমরা চাই সেটাতেই তারা শিখুক। মায়ের কোল থেকে নেমেই সে প্রথমে স্কুলে যায়, বাংলা ভাষায় কথা সে বুঝতে পারে না। ঠিক সে সময়ে তাদের হাতে এসব বই পৌঁছে দেব। আমরা প্রাথমিক স্তরে সেই ধরনের শিক্ষকও তৈরি করতে চাই।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কর্মকর্তারা জানান, এবার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ২৪ হাজার শিশুর হাতে তাদের নিজেদের ভাষায় লেখা বই তুলে দেওয়া হবে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জানান, প্রতি বছরের মতো আগামী ১ জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক উৎসব করে সব শিক্ষার্থীর হাতে বই তুলে দেওয়া হবে। আগামী শিক্ষাবর্ষে ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার বই ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হবে।

চলতি শিক্ষাবর্ষে ৩৩ কোটি ৩৭ লাখ ৪৭ হাজার ৯৭২টি বই বিতরণ করেছিল সরকার। সেই হিসেবে এবার ২ কোটি ৮৪ লাখ ৩৪ হাজার ২৩৭টি বই ও শিক্ষা উপকরণ বেশি বিতরণ করা হবে।

বিনামূল্যে বিতরণের ৮০ শতাংশ বই এরই মধ্যে বিদ্যালয়ে পৌঁছে গেছে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সব বই পৌঁছে যাবে।

মায়ের ভাষায় কথা বলি, মায়ের ভাষায় লিখি পড়ি

ত্রিপুরা/ককবরক ভাষা :	আমানি ককবাই কক সাগো, আমানি ককবাই সুইঅ সুরুংগ
চাকমা ভাষা	: মাত্ বুল গুরি আমন ভাচ্চোই লেগালেগি গুরি - পড়াশুনা গুরি আমন ভাচ্চোই
গারো ভাষা	: আংথাংনি খুকো জাক্কিলবো আংথাংনি খুকো রিপ্পিংবো
মারমা ভাষা	: মিমি বাসাগো লেক্যাংবা মিমি বাসাগো থিনসিংবা
উঁরাও/সাদরী ভাষা	: মায়কের কাথা কাহবেই মায়কের কাথানে লিখা পার্হা কারবেই

এমএলই ফোরাম-এর ৩৮তম সভা

গত ১৩ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখ বিকাল ৩:৩০ মিনিটে গণসাক্ষরতা অভিযান প্রশিক্ষণ কক্ষে 'এমএলই ফোরাম'-এর ৩৮তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায়, সভাপতিত্ব করেন দুই পর্যায়ে এমএলই ফোরামের সদস্য ও সেভ দ্য চিলড্রেনের শিক্ষা উপদেষ্টা জনাব ম. হাবিবুর রহমান ও সিপ্রাড-এর নির্বাহী প্রধান আলবার্ট মানকিন। এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন জ্যোতি এফ গমেজ, নটরডেম কলেজ, গোলাম মোস্তফা দুলাল- গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সৌরভ শিকদার- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মো. জাহিদুল কবির-ওয়ার্ল্ড ভিশন, প্রকৌ. রঞ্জন কুমার মিত্র-গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, মতি লাল হাজং, আইইডিএস, স্বপন চাকমা- ব্র্যাক, আল্পনা জয়ন্তী কুজুর-এসআইএল বাংলাদেশ, ওয়াসিউর রহমান তন্ময়- মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, মঞ্জুশ্রী মিত্র-নেটস বাংলাদেশ, মেহেরুন্নাহার স্বপ্না, সেভ দ্য চিলড্রেন ও গণসাক্ষরতা অভিযানের পক্ষ থেকে তপন কুমার দাশ, কে এম এনামুল হক, মো. শাহ্ আলম, মির্জা কামরুন নাহার, উম্মে সায়কা, তনুজা শর্মা, মেহেদী হাসান প্রমুখ।

সভাপতি ম. হাবিবুর রহমান সবাইকে স্বাগত জানিয়ে এমএলই ফোরামের ৩৮তম সভার কাজ শুরু করেন। গত সভার প্রতিবেদন পর্যালোচনার মাধ্যমে তিনি আলোচনা সভার সূচনা করেন।

এরপর সভায় এমএলই কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। তপন কুমার দাশ এ প্রসঙ্গে বলেন, সরকার ২০১৭ সালের শুরুতেই আদিবাসী শিশুদের হাতে নতুন বই তুলে দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর। তবে পরবর্তী পদক্ষেপগুলো নিয়ে সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রয়েছে।

মেহেরুন্নাহার স্বপ্না বলেন, NCTB কর্তৃক গ্রেড ৩ পর্যন্ত এমএলই উপকরণ উন্নয়ন বিষয়ে অনুমোদন রয়েছে। এ বিষয়টি হয়ত সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনেকেই জানেন না।

সৌরভ শিকদার বলেন- সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে এবং পরবর্তী গ্রেড-এর এমএলই উপকরণ উন্নয়নের কাজ অনেক দূর এগিয়েছে। ইতোমধ্যে NCTB একটি ব্রিজিং প্লান অনুমোদন করেছে। তাই গ্রেড-৩ পর্যন্ত উপকরণ না করার কোনো কারণ নেই।

কে এম এনামুল হক বলেন, Post PEDP III-তে কীভাবে MLE বিষয়ে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা যায়- সে বিষয়ে আলোচনা করা দরকার।

ওয়াসিউর রহমান তন্ময় বলেন, প্রকৃতপক্ষে আদিবাসী শিক্ষার্থীরা বই দিয়ে কী করবে তা আলোচনার বিষয়। বই বিতরণের সঙ্গে অনেক বিষয় রয়েছে, সে সব বিষয়সমূহ সুরাহা হওয়া দরকার। বিশেষ করে শিক্ষকদের ভাষার উপর প্রশিক্ষণ এবং তারা কীভাবে এমএলই বিষয়ক বইপত্র পড়াবে, এ দুটো বিষয়ের উপর জোর দিতে হবে।

তপন কুমার দাশ বলেন, আমরা যে যেভাবেই কাজ করি তা সরকারের মূলধারায় নিয়ে আসা জরুরি।

গণসাক্ষরতা অভিযান এর আরএমইডি ইউনিট কর্তৃক গৃহীত এবং অধ্যাপক সৌরভ সিকদার কর্তৃক সম্পাদিত 'পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী শিশুর মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষার বর্তমান চিত্র (মাঠ অভিজ্ঞতা)' বিষয়ক সমীক্ষার ফলাফলসমূহ সভায় উপস্থাপন করা হয়, উপস্থিত সদস্যবৃন্দ এ সমীক্ষা প্রতিবেদনের উপর তাদের মতামত দেন। এসব মতামত সন্নিবেশনের মাধ্যমে এ গবেষণা প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করার জন্যও আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা নিয়ে বিশেষ করে শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া ও ফলাফল নিয়ে এ ধরনের আরো কিছু সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য এমএলই ফোরাম তথা গণসাক্ষরতা অভিযানের কাছে অনুরোধ জানানো হয়।

দীর্ঘ আলোচনার পর সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব আবু হেনা মোস্তফা কামালের সঙ্গে দেখা করা এবং তাঁকে সার্বিক বিষয়ে অবহিত করা;
- জাতীয় পর্যায়ে এমএলই বিষয়ে সার্বিক অগ্রগতি এবং করণীয় বিষয়ে সেমিনার আয়োজন করা (ডিসেম্বর ২০১৬ বা জানুয়ারি ২০১৭-এর মধ্যে);
- এমএলই ফোরামের সদস্য সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ তৈরি করা;
- সকলের মতামতের ভিত্তিতে উপস্থাপনকৃত Study প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করা।

পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করেন

মো. শাহ আলম

মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের যৌক্তিকতা : প্রসঙ্গ চাকমা

বাংলাদেশে যতগুলো আদিবাসী রয়েছে তন্মধ্যে চাকমা আদিবাসীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৬০ সালের দিকে চাকমা ভাষাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সর্বপ্রথম বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে প্রচলন করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল চন্দ্রঘোনায় একটি Elementary School প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। সেখানেই সর্বপ্রথম চাকমা এবং মারমা নৃগোষ্ঠীর ভাষায় শিক্ষা দানের জন্য চাকমা ও মারমা ক্লাশ চালু করা হয়েছিল বলে জানা যায়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে হলেও সত্য যে, এর ধারাবাহিকতা কেন বজায় থাকেনি তা আমাদের কাছে এখনো প্রশ্নবিদ্ধ রয়ে আছে।

এরপর ১৯৫২ সালে সংঘটিত বাংলাদেশের জনগণের মাতৃভাষার মর্যাদার লড়াই ১৯৯৯ সালে এসে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে'র সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করার পর এদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি জনগোষ্ঠী মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের বিষয়টি নতুন করে গুরুত্ব পেতে শুরু করে। এ জন্য স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন উদ্যোগ নিয়েছে চাকমা শিশুদের প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির পূর্বেই চাকমা বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিতিমূলক পাঠদানের। এছাড়াও বর্তমান সরকার প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার পাঠদানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করছে বলে আমরা জেনেছি। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটও নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এটি নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য সুখকর সংবাদ। তাই সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে হবে।

একসময় জুমচাষ নির্ভর চাকমাদের জীবন যাপনের জন্য তাদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মাতৃভাষায় পাঠ গ্রহণের যেমন প্রয়োজন পড়েনি তেমনি বাংলা ভাষায় প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থাও তাদের সমাজকে আকর্ষণ করতে পারেনি। ফলে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় তারা আজও সুফল লাভ করতে পারছে না। অধিকন্তু বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যসূচিতে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম মূলত বাংলা ভাষাভাষী শিশুদের জন্য রচিত, যা সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিষয়বস্তুসমূহ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর পরিমণ্ডল নিয়ে থেকে যায়। এ সমস্ত পাঠ্যসূচি আদিবাসী চাকমা শিশুদের মনে স্বাভাবিক ভাবেই বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টির কারণে প্রাথমিক স্তরেই শতকরা ৩০ ভাগ চাকমা ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর শিশুকে স্কুল ত্যাগ করতে বাধ্য করে এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি হতে নিজেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখে। এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় আজ অবধি চাকমারা যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, চাকমারা দিন দিন তাদের নিজস্ব কৃষ্টিকে হারাতে বসেছে।

পারিবারিক জীবনে একটি চাকমা শিশু তার মাতৃভাষার গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে। একটি চাকমা শিশু জন্মের পর থেকে মাতৃভাষায় কথা বলা শিখলেও এবং ভাষাটির একটি নিজস্ব লিখিতরূপ থাকা সত্ত্বেও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তারা মাতৃভাষা চর্চা করার সুযোগ পাচ্ছে না। ফলে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষাস্তর থেকেই সে শিক্ষাগ্রহণে প্রতিনিয়ত নানাবিধ বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। এছাড়াও তাদের জীবন যাপন, আচরণ ও কৃষ্টির স্বকীয়তাও বিদ্যমান। তাই সমীক্ষায় চাকমা শিশুদের ঝরে পড়ার উচ্চহার দেখা যায়। এ সমস্ত কারণে চাকমা শিশুদের শিক্ষাজীবনের প্রথমদিন থেকেই মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। একটি শিশুর চিন্তা চেতনা ও মননের সঙ্গে ভাষাজ্ঞানের যে একটা সম্পর্ক বিদ্যমান তা অনস্বীকার্য। শিশু তার মনের এবং মেধার বিকাশ ঘটানোর জন্য নিজের ভাষায় ও বর্ণমালায় পাঠ করে যতটা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারবে সেটি ভিন্ন একটি ভাষায় সম্ভব হয় না। মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রথম দিন হতে স্কুলে প্রবেশ করে তার স্বকীয় জাতিসত্তা খুঁজে পায় এবং পাশাপাশি শিক্ষালাভের জন্য স্কুলের প্রতি তার দিনে দিনে আগ্রহ বাড়ে। তাই সঙ্গত কারণে শিশুকাল পর্যায়ক্রমে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিলে পরবর্তী শিক্ষা স্তরে পদার্পণের সময় প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তাদের মনে কোনো ভীতি জন্মাবে না। তাই প্রাথমিক স্তর থেকে সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাষায় ও বর্ণমালায় শিক্ষাজীবন শুরু করে দিয়ে পর্যায়ক্রমে জাতীয় মূল স্রোতোধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আনুপাতিক হারে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করা উচিত।

অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কথা বিবেচনায় না আনা উচিত। চাকমাদের মধ্যে শিক্ষার বিকাশ ঘটানোর জন্য অবশ্যই নিজ ভাষায় শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে সম্পূর্ণ নিজস্ব বর্ণমালায় পাঠদানের কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে। রিসোর্স পার্সনের অভাব দূর করতে হবে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনে বাংলাদেশ চাকমা ল্যাঙ্গুয়েজ কাউন্সিলের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

সুসময় চাকমা

সামাজিক শিক্ষা কেন্দ্র : বদলে গেছে শিমুলঝুড়ির সাঁওতাল পল্লী

শিমুলঝুড়ি সাঁওতাল পল্লীতে স্থাপিত হয়েছে সামাজিক শিক্ষা কেন্দ্র। প্রতিদিন বিকেল তিনটা বাজতেই পল্লীর নারী-পুরুষ দল বেঁধে শিক্ষা কেন্দ্রে আসে। তাদের পদচারণায় ও কলরবে মুখরিত হয় শিমুলঝুড়ি সাঁওতাল পল্লীর এ নিভৃত কোণ।

মার্চ ২০১৬ থেকে গণসাক্ষরতা অভিযান গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র এর সহযোগিতায় রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলায়, লোহালীপাড়া, ইউনিয়নে শিমুলঝুড়ি সাঁওতাল পল্লীতে এ সামাজিক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করে আসছে।

কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই স্থানীয় আদিবাসীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। শিক্ষা কেন্দ্রটি শুরু থেকে শুক্রবার ব্যতীত সপ্তাহে প্রতিদিন বিকেল তিনটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত চলে কেন্দ্রটির নিয়মিত পাঠদান। নিয়মিত পাঠদান ছাড়াও কেন্দ্রটিতে আদিবাসীরা তাদের মাতৃভাষায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমও করে থাকে। কেন্দ্রটিকে ঘিরে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম দিন দিন বেড়েই চলছে। আদিবাসীদের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রায় সময়ে শিক্ষা কেন্দ্রটিতে ইস্যুভিত্তিক আলোচনা করা হয়ে থাকে, যেমন - বাল্যবিবাহের কুফল, যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন/ স্যানিটেশন ব্যবস্থার গুরুত্ব ইত্যাদি। সাঁওতাল পল্লীর সকলে এই শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পেরেছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। এ বিষয়ে শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা কমিটির সভাপতি শ্যামল টুডু বলেন, সামাজিক শিক্ষা কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠার আগে শিমুলঝুড়ির সাঁওতাল পল্লীর অনেকেই নিজের নামটি পর্যন্ত লিখতে বা পড়তে পারত না। কিন্তু কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠার পরে সকলে লিখতে ও পড়তে পারে এবং সকলে নিজের হিসাবও করতে পারে। এখন বিভিন্ন বিষয়ে তারা অনেক সচেতন হয়েছে। তবে সাঁওতালরা বাংলা ভাষায় যেমন শিখছে, তেমনি তাদের মাতৃভাষায়ও যদি শিক্ষা প্রদান করা যেত, তাহলে অনেক দ্রুত শিখতে পারত।

শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থী মুন্নি সরেন বলেন- 'হামরা আগত্ কিচু জানচেনো না, অ্যাটে কোনা আসি হামরা একন লেখ্পার পারি, পড়বার পারি, হামারা ম্যালা কিচু শিক্পার পাইচি। মুইতো অ্যালা পেপারও পড়িবার পাও।'

শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে এখনকার শিক্ষার্থীরা নিজের জন্য সঞ্চয় শুরু করেছে যার মধ্য দিয়ে তারা ভবিষ্যতে কিছু করবার স্বপ্ন দেখছে। শিমুলঝুড়ি সাঁওতাল পল্লীর এই সামাজিক শিক্ষা কেন্দ্রটি সাঁওতাল আদিবাসীদের জীবনমান বৃদ্ধিতে এক অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে।

উল্লেখ্য, গণসাক্ষরতা অভিযান **অঙ্গীকার** প্রকল্পের আওতায় জানুয়ারি ২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশের ৬ টি জেলার প্রত্যন্ত এলাকার শিমুলঝুড়ির মত আরও ৫ টি সামাজিক শিক্ষা কেন্দ্র (সিএলসি) পরিচালনা করছে। যার মূল উদ্দেশ্য হলো পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন করা।

মো. মেহেদী হাসান

জিয়াতভার সামাজিক শিক্ষা কেন্দ্র

নওগাঁ-র পোরশা উপজেলার নোনাহার গ্রামে গণসাক্ষরতা অভিযান ও সহযোগী পার্টনার এনজিও লাহান্তি ফাউন্ডেশন-এর যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় পর্যায়ে একটি সামাজিক শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা হচ্ছে।

উপর্যুক্ত শিক্ষা কেন্দ্রের সকল শিক্ষার্থী উঁরাও সম্প্রদায়ের। উঁরাও ভাষার আদলে শিক্ষা কেন্দ্রটির নামকরণ করা হয়েছে "জিয়াতভার সামাজিক শিক্ষা কেন্দ্র" অর্থাৎ যে কেন্দ্র থেকে মানুষ আজীবন শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

কেন্দ্রে নিয়মিত মৌলিক সাক্ষরতা ক্লাশ, ইস্যুভিত্তিক আলোচনা, বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। কেন্দ্রের সদস্যগণ নিয়মিত কেন্দ্রে আসেন, টিভি দেখেন ও পত্রিকা পড়েন। ইতোমধ্যে শিক্ষা কেন্দ্রের সদস্যগণ আদিবাসী দিবস, মানবাধিকার দিবস, বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করেছে। নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের সাথে যুক্ত হয়েছে কেন্দ্রের শিক্ষার্থীগণ।

ভবিষ্যতে কেন্দ্রটি সচল রাখার জন্য সঞ্চয়ের উদ্যোগও গ্রহণ করেছে কেন্দ্রের সদস্যগণ।

উর্মিলা সরকার

‘চাকমা বাল্যশিক্ষা’র খবর কী

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ‘চাকমা উপন্যাস চাই’ শিরোনামে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন ১৯৯৩ সালে। যে বছর তাঁর মৃত্যু হয়, সেই ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর সই হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম ‘শান্তি’ চুক্তি, এখনও যেটির পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি। অবশ্য বেশ কিছু ক্ষেত্রে নতুন আইন হয়েছে, নতুন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হয়েছে, কিন্তু কাগুজে অনেক ঘোষণাই বাস্তবরূপ পায়নি এখনও। যেমন, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের জন্য ১৯৯৮ সালে প্রণীত আইনগুলোতে বলা হয়েছে, এই প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন কাজের একটি হবে প্রাথমিক স্তরে ‘মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা’র ব্যবস্থা করা। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো জেলা পরিষদই এ ব্যাপারে যথাযথ উদ্যোগ নেয়নি।

অন্যদিকে, ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে আদিবাসী শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার ঘোষণা থাকলেও সেটি এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। কথা ছিল, ২০১২ বা ২০১৩ সালের মধ্যে সরকারিভাবে চাকমাসহ মোট ছয়টি আদিবাসী ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হবে এবং পর্যায়ক্রমে অন্য ভাষাগুলোকেও একই কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে, কিন্তু ২০১৬ সাল পর্যন্ত একটি ভাষাতেও এটি শুরু হয়নি। এমতাবস্থায় কেউ যদি বলে বসেন, ‘চাকমা উপন্যাসের কথা এখন থাক, আগে চাকমা বাল্যশিক্ষার বই হোক’, তাহলে খুব একটা দোষ দেওয়া যাবে না তাদের।

অবশ্য সরকারি পর্যায়ের স্থবিরতা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত উদ্যোগে বেশ আগেই, ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয়ে গেছে চাকমা ভাষা ও হরফে দেবপ্রিয় চাকমার লেখা ‘ফেবো’ নামের একটি উপন্যাস। প্রকাশিত খবর অনুসারে এই উপন্যাসের পটভূমি হলো ১৯৮৬ সালে খাগড়াছড়ি জেলার লোগাংএ সংঘটিত একটি হত্যাকাণ্ড, আর শিরোনামে ব্যবহৃত শব্দটির দ্বিবিধ অর্থ হলো ‘ভয়ার্ত মুহূর্ত’ ও ‘ভয়ঙ্কর প্রাণি’।

‘চাকমা ভাষায় লিখিত প্রথম উপন্যাস’ হিসেবে ‘ফেবো’ নামটি ইতোমধ্যে বিসিএস গাইড ধরনের কিছু পরিসরে জায়গা পেলেও উপন্যাসের বিষয়বস্তু বা অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক তথ্য এসব জায়গায় নেই। আর সাধারণভাবে উপন্যাসটি কত জন পড়েছেন, পাঠকেরা এটি কীভাবে গ্রহণ করেছেন, এসব ব্যাপারেও বিশদ কোনো তথ্য কোথাও অন্তত ইন্টারনেটে খুঁজে পাওয়া যায় না।

উল্লেখ্য, ‘ফেবো’ প্রকাশের পর এক দশক না পেরুতেই ২০১৩ সালে কে ভি দেবাশীষ চাকমা নামের আরেক জন লেখকেরও চাকমা ভাষায় একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে, যেটির শিরোনাম ‘মুই মত্যেই’ (‘আমি আমার’)। উপন্যাস দুটির কোনোটি সাহিত্য হিসেবে চাকমা সমাজে খুব একটা সাড়া ফেলেছে, এমন আলামত মেলে না। আসলে এই মুহূর্তে কেউ যদি খুব উঁচু মানের উপন্যাসও চাকমা ভাষায় লিখে ফেলেন, নানা কারণে সেটির পাঠক খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে।

উল্লেখ্য, প্রকাশিত খবর অনুসারে দেবাশীষ চাকমার ‘ফেবো’ ছাপানো হয়েছিল চাকমা হরফে হাতে লেখা টেক্সটের ছবির ভিত্তিতে। অন্যদিকে কে ভি দেবাশীষ চাকমার ‘মুই মত্যেই’ ছাপানো হয়েছে বাংলা হরফে। তবে হরফের বিষয়টা আসলে গৌণ; কারণ স্রেফ কারিগরি দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর যে কোনো ভাষা যে কোনো হরফের মাধ্যমে লিখিত রূপ দেওয়া সম্ভব। কিন্তু ব্যাপক পরিসরে কোনো ভাষার লিখিতরূপে চর্চিত হওয়ার জন্য বেশ কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে; যেমন সামাজিক চাহিদা, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং কারিগরি বিভিন্ন বিষয়সহ একাধিক ক্ষেত্রে দক্ষ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সময়োপযোগী নেতৃত্ব। বাংলাদেশে চাকমা বা অন্য কোনো প্রান্তিক জাতির বেলায় এসব শর্ত পূরণ হয়েছে, তা বলা যায় না।

যেখানে আদিবাসী শিশুরা এখনও প্রাক-প্রাথমিক স্তরেও সরকারিভাবে নিজেদের ভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ পায়নি এবং আদিবাসী জনগণ দেশের সর্বত্র ভূমি-জীবন-সম্ভ্রম রক্ষার সংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত, সেখানে তাদের কাছ থেকে নিজেদের ভাষায় লেখা ‘দুর্গেশনন্দিনী’ বা ‘চিলেকোঠার সেপাই’ মানের উপন্যাস খুঁজতে যাওয়ায় যদি কেউ নির্বোধ আশাবাদ বা নিষ্ঠুর রসিকতা হিসেবে দেখেন, তাহলে কি খুব ভুল হবে? (সংক্ষেপিত)

প্রশান্ত ত্রিপুরা

বম ভাষার ব্যবহার ও চর্চা ক্ষেত্র

বম ভাষা, বর্ণমালা ও সাহিত্য চর্চার প্রধান ক্ষেত্র দুটি- (এক) ধর্মীয় আর (দুই) সামাজিক। বর্তমানে বম, পাংখুয়া এবং লুসাইরা একশত ভাগই খ্রিস্ট্রান। তাদের মাঝে খ্রিস্টধর্ম প্রচার শুরু হয় ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে। ভারতের মণিপুর ও মিজোরামের লুসাইরা একই ভাষাভাষী বমদের কাছে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন। ১৯১৮ সাল হতে বম জনগোষ্ঠী পর্যায়ক্রমে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়াতে বর্তমানে এদের ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিবর্তনের পাশাপাশি সামাজিক রীতি-নীতিতেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। সামাজিক আচার-আচরণ, বিচার-সালিশ ব্যবস্থা পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বম সম্প্রদায় ১৯৪৮ সালে প্রথম Bawm Dan Bu (Bawm Customary Law) নামে একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করে। একে বম সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংবিধান বলা চলে। এই সংবিধানটি সর্বশেষ ১৯৯৫ সালে সংশোধনী আকারে মুদ্রিত হয়। বম সমাজের প্রাচীন রীতি-নীতি, প্রথা ও ঐতিহ্যের সমন্বয়ে বম সমাজের নেতৃবৃন্দ সর্বসম্মতভাবে ১৯৮৫ সালে বম সোস্যাল কাউন্সিল গঠন করে। ভাল কথা যে, বম সমাজের শতকরা আশি জন নিজ ভাষায় লেখাপড়া জানে। চিঠিপত্র, লেনদেন, হিসাবপত্র, সভা-সমিতির কার্য বিবরণী, নথিপত্র তথা সামগ্রিক সামাজিক যোগাযোগ বম ভাষায় সম্পাদিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে বম সমাজ অনেকখানি এগিয়ে আছে। বম জনগোষ্ঠী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক কিংবা স্ব-উদ্যোগে ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও তা চর্চা করে থাকে। এ ক্ষেত্রে বম সমাজ, অনেকখানি এগিয়ে আছে। এই ভাষায় তারা চিঠিপত্র, হিসাব-নিকাশসহ সরকারি সকল কাজ করে থাকেন। বর্তমানে বমদের শতকরা ৮০ জন নিজ মাতৃভাষায় লেখাপড়া জানেন। বর্ণমালা পরিচিতি প্রাথমিক বই (Bawm Premier) পারিবারিক উদ্যোগে অথবা গীর্জা অথবা পাড়া, সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় শিশুদের পড়ানো হয়। বাইবেল ছাড়াও ধর্মীয় সংগীত, বাইবেলের ব্যাখ্যাসহ ধর্মীয় পুস্তক এবং বিবিধ বিষয়ের বই-পুস্তক বম ভাষায় রয়েছে। বম ভাষায় দুটি পত্রিকা বের হয়- একটি মাসিক, অন্যটি ত্রৈমাসিক। বম ভাষায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ধর্মীয়, উন্নয়নমূলক সচেতনতামূলক বিবিধ বিষয়ের বই পুস্তকের প্রকাশনা রয়েছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন Dr. Lorenz Loffer-এর সহযোগিতায় সম্পাদিত বম ভাষার একটি অভিধান (Dirctory) আছে।

বম ভাষার ব্যবহার ও চর্চার শক্তিশালী অন্যক্ষেত্র হল গান। গান মানুষের আদিম সৃষ্টি। বমদের লৌকিক জীবনে কত যে গান! প্রাত্যহিক জীবনে বিশেষ করে জুম জীবনের নানান ক্রিয়া-কর্ম, লৌকিক উৎসব, সাংসারিক নানান ঘটনা-দুর্ঘটনা, বিচ্ছেদের কথকতা গানে গানে মূর্ত করেছে। বমদের লোকসংগীত বিশেষ স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। লোকসংগীতের কাইলেক, লা ফিং, লা তুং গান বৈচিত্র্যে, মাধুর্য্যে ও ভাবে সমৃদ্ধ। এগুলো মূলত ভাবপ্রধান গান। এ গান বিষয়, ভাব, রস আর সুরের দিক দিয়ে অত্যন্ত সমৃদ্ধ, সাহিত্যের বিচারে মানসম্পন্ন। বম আদিবাসীদের সমাজ জীবনের প্রধান অনুষঙ্গ গান আর গান। এমন কোনো লৌকিক উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান নেই যেখানে গীত নেই। ভাল লাগার না লাগার, সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, হাসি-কান্না, আনন্দ-উল্লাসের অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি স্তরে গানে গানে মূর্ত করে তোলা হয়। তাই বলা হয়-

নান দু থু সিম লা উ
নান দু লা সাক উ।

বাংলা :

মিনতি করি কহিও না কথা
গাহিও গান পরান ভরিয়া

প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রাণের আর্তি, বিরহব্যথা, দৈনন্দিন জীবন সমস্যা, সমাজের মানুষের মনের কথা, প্রেম-ভালবাসা, মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সমস্তই প্রকাশ পায় সংগীতে। বম গানগুলোর ভাবের গভীরতা, ছন্দ, তাল এবং সাহিত্যগুণ খুবই উচ্চমানের।

জির কুং সাহু

সাংগ্রাম আন্দোলনে উরাঁও

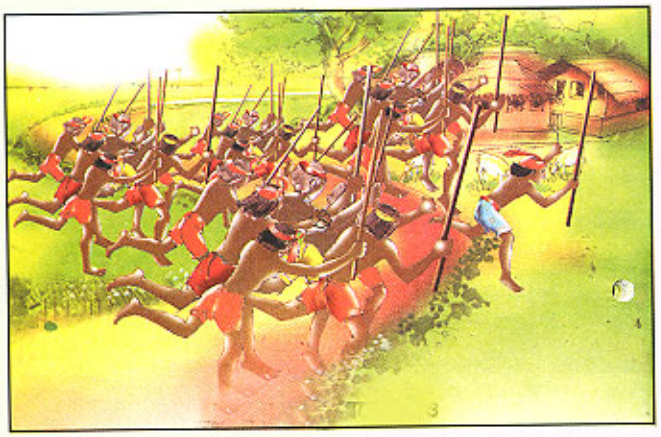

উরাঁওমানকের সাংগ্রাম ভারত উপমহাদেশনে নিজেমানকের প্রেরুনায় এক ও সাপেরকে পরিচালনা হওয়েলা সেমানকের সংগ্রাম। ভারতবর্ষ ঠিনসে উ সংগ্রামনে বানুয়ামান উরাঁওমান সহায়তা নেই পালাহান। বরং উরাঁওমানকের সংগ্রাম দমননে ভারতবর্ষকের সিপাহীমান অস্ত্র চালায়হান।

১৮৫৭ সালে মুন্ডা বিদ্রোহ হওয়েলা। ১৮৮৬ সালে আবারও বিট্রিশমানকের সাঙ্গে লড়াই হওয়েলা। এ লড়াইনে নেতৃত্ব দেওয়েলা বিরশা ভাগোয়ান (মুন্ডা) ও যাতরা উরাঁও। এ লাড়াই সারদার লাড়াই নামনে চিনহায়না। ব্রিটিশ সারকার বিরশা ভাগোয়ানকে (মুন্ডা) ধ্যারকে রাঁচী জেল খানানে, পরে হাজারী-বাগ জেল খানানে বন্দী কারকে রাখলান। ১৯০২ সালকের ৯ই জুন বন্দী রাখালঠিনা মরগেলেই।

বাংলাদেশকের মহান মুক্তিযুদ্ধনে উরাঁওমান দেশপ্রেম, নিষ্ঠা ও সাহসকের সাঙ্গে যোগদেই রাহান। ৭ নম্বর সেক্টর কমান্ডার কর্নেল কাজী নূরুজ্জামানকের নির্দেশনে নওগাঁ জেলাকের ধামইরহাট ও সাপাহার উপজেলাকের কায়েক জাঘানে জেসেন সিলন্টী, আগ্রাদ্বিগুণ, কুরমেইল, হাটশাউল, পোড়াশাউল, আলাপসা, এলাকানে সবচেয়ে, ইয়াদ রাখেকনিয়ার যুদ্ধ হইরেহে। সাপাহার ও জবাই বিলনে দিনমান ও রাত্তামান ধ্যারকে যুদ্ধ হয়রেহে। উ আগুদানেকের যুদ্ধনে অংশগ্রহণ করে রাহান উরাঁওমানকের একটা দল। জানেক নিয়ার উরাঁও মুক্তিযোদ্ধাকের সংখ্যা প্রায় ৩৮ ঝান নিয়ার।

১৯৭১ সালকের ২৮ শে মার্চ উরাঁওমানকের নেতৃত্বনে হাজার হাজার আবদিন বিভিন্ন গাওসে তীর, ধানুক, লাঠি, টাঙ্গা, কোচ, সুলফি লেইকে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ ক্যাররাহান। সেঠিন প্রায় ৫০০ নিয়ার আবদিন মররাহান, উকের ভিতরে উরাঁওমান/বানুয়া শহীদ হইরাহান ১০০ নিয়ার।

এই ঘটনাকে ইয়াদ রাখেলে রংপুর ক্যান্টনমেন্টকের দাক্ষিণ ধ্যারনে নিসবেতগঞ্জনে 'রক্তগৌরব' বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ বেনালা হান। স্বাধীনতা যুদ্ধনে উরাঁও বানুয়ামানকের অবদানকের স্বীকৃতিস্বরূপ আরো একটা স্মৃতিসৌধ বেনালাহান। সেকের নাম 'অর্জন'। দুয়োনিয়ার স্মৃতিসৌধ তীর ধানুক চিনহা নিয়ার ধ্যারকে উঠায়হান বানেয়ামানকের বীরত্বগাথা।

সংগ্রাম আন্দোলনে উরাঁও

উরাঁওদের সংগ্রাম ভারত উপমহাদেশে নিজেদের প্রেরণা, ঐক্য ও উদ্যোগে পরিচালিত হয়। ভারতীয়দের কাছ থেকে এ সংগ্রামে উরাওরা সহায়তা পায়নি। বরং উরাঁওদের সংগ্রাম দমনে ভারতবর্ষের সিপাহীরা অস্ত্র চালিয়েছে।

১৮৫৭ সালে মুণ্ডা বিদ্রোহ হয়। ১৮৮৬ সালে আবারও ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াই হয়। এ লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেন বিরশা ভাগোয়ান (মুণ্ডা) ও যাতরা উরাঁও। এ লড়াই সারদার লড়াই নামে পরিচিত। ব্রিটিশ সরকার বিরশা ভাগোয়ানকে গ্রেফতার করে রাঁচী জেলখানা এবং পরে হাজারীবাগ জেলখানায় বন্দী করে রাখে। ১৯০২ সালের ৯ জুন বন্দী অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে উরাওরা দেশপ্রেম, নিষ্ঠা ও সাহসের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। ৭ নম্বর সেক্টর কমান্ডার কর্নেল কাজী নূরুজ্জামানের নির্দেশে নওগাঁ জেলার ধামইরহাট ও সাপাহার উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় যেমন সিলন্টী, আগ্রাদ্বিগুণ, কুরমেইল, হাটশাউল, পোড়াশাউল, আলাপসা এলাকাতে সবচেয়ে স্মরণীয় যুদ্ধ হয়েছিল। সাপাহার ও জবাই বিলে সারাদিন ও সারারাত ধরে যুদ্ধ হয়েছিল। সেই সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল উরাওদের একটি দল। জানা মতে, উরাও মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৮ জনের মতো।

১৯৭১ সালের ২৮ মার্চ উরাও আদিবাসীদের নেতৃত্বে হাজার হাজার মানুষ বিভিন্ন গ্রাম থেকে তীর, ধনুক, লাঠি, সোটা, কোচ, বল্লম নিয়ে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করেছিল। সেখানে প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষ শহীদ হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে উরাঁও আদিবাসী শহীদ হন শতাধিক। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ ঘটনার স্মরণে রংপুর ক্যান্টনমেন্টের দক্ষিণ পাশে নিসবেতগঞ্জে 'রক্তগৌরব' নামে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়।

স্বাধীনতা যুদ্ধে উরাঁও আদিবাসীদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ রংপুর জেলা শহরের মডার্ণ মোড়ে আরও একটি স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়। এর নাম 'অর্জন' উভয় স্মৃতিসৌধে তীর-ধনুক চিহ্নের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে উরাঁও আদিবাসীদের বীরত্বগাথা।

আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা নরেন্দ্র মারাক

১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসের পড়ন্ত বিকেল। মাঠে ধানের চারা লাগানোর জন্য জমি তৈরি করছিলেন নরেন্দ্র মারাক। শেরপুরের ঝিনাইগাতির নকশি গ্রামে তখন পাহাড়ের নীরবতা। হঠাৎ চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ছুটে গেলেন বাড়ির দিকে। ততক্ষণে সব শেষ। দাউদাউ করে জ্বলছে তার কাঠের দোতলা বাড়িটি। আর ধান-চালসহ যা কিছু ছিল সব নিয়ে গেছে স্থানীয় মুসলিম লীগের নেতা-কর্মীরা। উপায়ন্ত না দেখে নকশীর ঠিক ওপারেই, ভারতের নোকুচি গ্রামে সপরিবারে চলে যান নরেন্দ্র। প্রায় বছর খানেক পরে ফিরে এসে আবারও বসবাস শুরু করেন। তবে দুই ছেলেকে রেখে আসেন মাসির কাছে।

শুধু নরেন্দ্র মারাক নন, সেই সময় গারো পাহাড়ের আদিবাসীদের অনেকেই এভাবে অত্যাচারিত হয়ে দেশত্যাগ করেছিলেন। যাদের বেশির ভাগই আর ফেরেননি।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সময় থেকেই গারো পাহাড়ের আদিবাসীদের ওপর অত্যাচার নিপীড়ন চলতে থাকে, সম্পত্তি দখলের জন্য মুসলিম লীগের সীমাহীন অত্যাচার, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্ (ইপিআর)-এর পাকিস্তানি সদস্যদের নির্যাতন, অতিষ্ঠ করে তুলেছিল আদিবাসীদের। পরে ১৯৬৪-৬৫ সালের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় ভারতের বিহার উড়িষ্যা থেকে মুসলমানদের বিতারিত করা শুরু হলে এখানে থেকে আদিবাসীদেরও বিতারিত করার প্রয়াস চালান মুসলিম লীগ নেতারা, ছয় লাখের মধ্যে প্রায় দুই লাখ আদিবাসীকে দেশ ছাড়তে বাধ্যও করা হয়। তখন থেকেই স্বাধীনতাবাসী হয়ে ওঠে গারো পাহাড়ের আদিবাসীরা। একাত্তরে তাই ব্যাপকভাবে সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন তারা।

১৯৭১ সালের এপ্রিলের শুরুতে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণ শুরু হলে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের নোকুচি গ্রামে হরিমুল কোচের বাড়িতে আশ্রয় নেন নরেন্দ্র মারাক। তার সঙ্গে ছিলেন বাঙালি ইপিআর সদস্য মোহাম্মদ নূর। সেখানে ৭ দিন থেকে হালচাতি গ্রামে শরণার্থী শিবিরে যান। এখানে নেতারা এসে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য নাম চাইতেন। নরেন্দ্র নাম লিখিয়ে ৭ দিন পর চলে যান ডালুর ইয়ুথ ক্যাম্পে। সেখানে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর ভারতীয় সেনাবাহিনী ট্রাকে করে তাদের নিয়ে যায় রংনাবার্গ ট্রেনিং ক্যাম্পে। এরপর তাকে আলম কোম্পানিতে অন্তর্ভুক্ত করে ৩০০ জনের একটি টিমকে পাঠানো হয় সীমান্তবর্তী এলাকা পোড়া কাইশায়। যার এপারে বাংলাদেশের তাওকোচা। প্রথম অপারেশনে জুনের শেষের দিকে তাদের পাঠানো হয় ফুলপুর কালীগঞ্জের ব্রিজ ওড়াতে। এরপর ডালু ক্যাম্পে থেকে নভেম্বর পর্যন্ত গেরিলা হামলা চালান তারা। ডিসেম্বরে ভারতীয় আর্মির সহায়তায় পাকবাহিনীর নকশি ক্যাম্প দখল করে তারা শেরপুরের দিকে মার্চ করেন।

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক এমএলই নিউজলেটার পহর প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকার মান উন্নয়নের জন্য মতামত প্রদান করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ বিষয়ে যে কোনো ধরনের মতামত 'গণসাক্ষরতা অভিযান'-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-এর সহায়তায় 'অঙ্গীকার' প্রকল্পের আওতায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।

ফোন : ৮১১৫৭৬৯; ৯১৩০৪২৭, ৫৮১৫৫০৩১-২; ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org
www.facebook.com/campebd, www.twitter.com/campebd

European Union

গণসাক্ষরতা অভিযান
CAMPAIGN FOR POPULAR EDUCATION